



Vol. 55 | No. 2 | 2018



সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে উপনিবেশিত বাংলা

Volume	55
Issue	2
Year	2018
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Biswajit Ghosh
Published online	February 1, 2018
DOI	10.62328/sp.v55i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v55i2.1
Pages	১-১৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে উপনিবেশিত বাংলা

বিশ্বজিৎ ঘোষ*

সারসংক্ষেপ : বাংলা ছোটগল্পের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। সমকালীন জীবনের বিচিত্র চলচ্ছবি শিল্পময় হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটগল্পে। বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, মন ও মনস্তত্ত্বে কী গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা এ-প্রবন্ধে বিশ্লেষিত হয়েছে।

বাংলা ছোটগল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর হাতেই ঘটে বাংলা ছোটগল্পের উজ্জ্বল মুক্তি। কেবল নতুন রূপকল্প হিসেবেই নয়, বাঙালির বাস্তব জীবনের স্বাদ আর সৌরভ, আশা আর আনন্দ, দুঃখ আর বেদনার শব্দপ্রতিমা হিসেবে গল্পগুচ্ছ আমাদের সাহিত্যের এক চিরায়ত সম্পদ। ঔপনিবেশিক শাসনের এক বিশেষ পর্যায়ে বাংলার পল্লিগ্রাম যে অর্থনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করে এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদের প্রভাবে বাংলায় দেখা দেয় যে নবতর জীবনবোধ, বস্তুত, এই দ্বৈতপ্রবণতাই সম্ভব করেছিল ছোটগল্পিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের দীপ্র আবির্ভাব। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের তুঙ্গ পর্বে রবীন্দ্রনাথের গল্প রচনার সূত্রপাত। কলকাতার নগরজীবনের ওপর ঔপনিবেশিক শাসনের নানামাত্রিক রূপ তিনি যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি জমিদারি দেখভালের জন্য শিলাইদহ-শাহজাদপুর-পতিসরে আসার ফলে বাংলার পল্লি-সংগঠন এবং গ্রামীণ জীবনের উপর ওই শাসনের প্রভাবও তাঁর অগোচর থাকেনি। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায়, বিশেষত ছোটগল্পে, উপনিবেশিত বাংলার বহুমাত্রিক রূপ শিল্পিতা পেয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় মানবসম্পর্ক কীভাবে বিনষ্ট হয়েছে, মেকলের মেকি-শিক্ষার ফলে কীভাবে মধ্যবিত্ত-মানস আত্মরতির পক্ষে নিমগ্ন হয়েছে, কেন্দ্র-প্রান্তের সম্পর্কের ব্যবধান ক্রমশ কীভাবে স্ফীত হয়েছে, নিম্নবর্গের ওপর জমিদারি ব্যবস্থার দাপট কীভাবে দুর্বিষহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, কীভাবেই-বা দেখা দিয়েছে নারী-ব্যক্তিত্ব, জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং দ্রোহবাসনা – তারও ছবি পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে। উপনিবেশের অধিবাসী হয়েও উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনায় বাংলার মানুষের আত্মিক ও জাগতিক মুক্তির কথা উচ্চারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ –

*উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ।

‘গল্পগুচ্ছে’ তাঁর এই নতুন জীবনবাদ উচ্চারণের অভ্রান্ত সাক্ষী হয়ে আছে। ভাবতে বিস্ময় লাগে, শতবর্ষের অধিক কাল আগে ঔপনিবেশিক শাসনের যে কদর্য রূপ রবীন্দ্রনাথ অঙ্কন করেছেন, সে-সময় অধিকাংশ ভারতীয় ভাবুক-চিন্তাবিদ মোহমত্ত ও আচ্ছন্ন ছিল পাশ্চাত্য চিন্তাচর্চায়।

‘গল্পগুচ্ছে’র আপাত সারল্যের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের এই সমাজদৃষ্টি বিশেষ সমীক্ষার দাবি রাখে। ছোটগাল্লিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন ঔপনিবেশিক শাসনের নানামাত্রিক ছবি, একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিপ্রতীপে কোথায় আছে দ্রোহের উৎস তার সন্ধানও। উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের আলোয় কীভাবে ঘটবে মানুষের আত্মিক মুক্তি তারও অভ্রান্ত ইঙ্গিত আছে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গল্পে। আজকের এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সব গল্প সমীক্ষার সুযোগ নেই, কেবল অতি প্রাসঙ্গিক কতিপয় গল্পের পাঠ অনুসরণ করে আমাদের প্রতিপাদ্যটি দাঁড় করানোর চেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সাহিত্য-শিল্পকলা-রাজনীতি ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ঐতিহাসিক এবং ধারণাগত অনুসন্ধিসূচক ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে এসব তত্ত্ব। সতেরো-আঠারো বা উনিশ শতকে সমুদ্রযাত্রার মাধ্যমে এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায় নিজেদের সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেছিল ইউরোপ। বাণিজ্যের ছদ্মাবরণে ইউরোপ এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার শাসন ক্ষমতা দখল করেছে, লুণ্ঠন করেছে অধিকৃত ভূখণ্ডের সম্পদ, প্রচার করেছে খ্রিস্টবাদ। সমুদ্র অভিযান বা ভ্রমণের মাধ্যমে বিজিত দেশগুলো দখল এবং নানা তথ্য-উপাত্ত করতলগত করার কারণে ইউরো-মানসিকতায় এক ধরনের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের জন্ম দিয়েছিল, সৃষ্টি করেছিল কালো-মানুষের ওপর সাদা-মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা এবং এরই অনুষঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল সাদা-কালো প্রভু-দাসের অমোচনীয় যুগ্ম-বৈপরীত্য (binary-opposition)। পাঠক, একটু পরেই আমরা এই তত্ত্বের আলোকে পোস্টমাস্টার আর রতনের অন্তর্জগতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করব, পৌঁছতে চাইব ‘একরাত্রি’র আমি আর সুরবালার অন্তর্ভূতবনে।

ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন, হল্যান্ড, ফ্রান্স – এসব দেশ পনেরো শতক থেকে সমুদ্রজয়ের মাধ্যমে মূলত জয় করেছিল গোটা পৃথিবীকে। ওইসব সমুদ্রযাত্রা কেবল দেশজয়ই ছিল না, ছিল তথ্য-উপাত্ত ও জ্ঞানভাণ্ডার জয়ের অনন্ত অভিযাত্রা। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত ও ভূগোলজ্ঞানের মাধ্যমে ইউরোপ অন্যদের (native) দুর্বলতা ও সম্পদ সম্পর্কে যেমন অবহিত হয়েছিল, তেমনি ধারণা লাভ করেছিল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব তথা শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে। বোধ করি এ কারণেই কথাকোবিদ ফ্রানৎস্ কাফকা ইউরোপের সমুদ্রজয়কে আখ্যায়িত করেছিলেন জ্ঞানযন্ত্র বা knowledge machine

(Kafka 2007 : 31) অভিধায়। নবলন্ধ এই জ্ঞান দ্বারা ইউরোপ যে যুগ্ম-বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছিল, ঔপনিবেশিক দেশগুলো তা গভীরভাবে অনুসরণ করতে শুরু করে, বিজিত দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দেয় সে যুগ্ম-বৈপরীত্য এবং বিজিত দেশের মানুষদেরও, তাদের দৃষ্টিতে যারা অপর (other), বাধ্য করায় সে যুগ্ম-বৈপরীত্যে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে। এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের কিছু নমুনা এ রকম : শাসক-শাসিত, সাদা-কালো, সভ্য-অসভ্য, উন্নত-আদিম, গতিশীল-স্থবির, ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, মানবিক-পাশব, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, জ্ঞানী-মূর্খ, চিকিৎসক-রোগী, কেন্দ্র-প্রান্ত ইত্যাদি। লেখাই বাহুল্য যে, এসব যুগ্ম-বৈপরীত্যের প্রথমটি নির্দেশ করে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিকে, আর দ্বিতীয়টি উপনিবেশিত পৃথিবীকে। ইউরোপ বোঝাতে চেয়েছিল যা কিছু ভালো সুন্দর মানবিক এবং যৌক্তিক তার সবটাই ইউরোপের; উপনিবেশিত পৃথিবী কেবলই অসুন্দর ইতর মূর্খ অমানবিক আর প্রান্তিক। পাঠক, এই তাত্ত্বিক আলোতেই একবার চোখ ফেরানো যাবে ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পের শশিভূষণের নির্মম অসহায়তার ওপর।

সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অধিকৃত ভূখণ্ড ও মানবমণ্ডলী (natives) সম্পর্কে একটা পার্থক্যসূচক মানদণ্ডও প্রতিষ্ঠা করে দিলো ইউরোপ। এই পার্থক্য সাংগঠনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনোজাগতিক – সব দিকেই ক্রমে প্রভাব বিস্তার করল। যুগ্ম-বৈপরীত্য এই সত্য প্রতিষ্ঠা করল যে, ইউরোপ হচ্ছে উন্নত ও সভ্য, অবশিষ্ট বিশ্ব হচ্ছে অনুন্নত এবং অসভ্য; ইউরোপ হচ্ছে কেন্দ্র (centre) এবং অবশিষ্ট বিশ্ব হচ্ছে তার প্রান্ত (periphery)। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় সমালোচকের এই মন্তব্য:

Colonialism could only exist at all by postulating that there existed a binary opposition into which the world is divided. The gradual establishment of an empire depended upon a stable hierarchical relationship in which the colonized existed as the other of the colonizing culture. Thus the idea of the savage could occur only if there was a concept of the civilized to oppose it. In this way a geography of difference was constructed, in which differences were mapped (cartography) and laid out in a metaphorical landscape that represented not geographical fixity, but the fixity of power. Imperial Europe became defined as the ‘centre’ in a geography at least as metaphysical as physical. Everything that lay outside that centre was by definition at the margin of the periphery of culture, power and civilization. (Ashcroft 2013 : 36-37)

ঔপনিবেশিক শক্তি চায় কেন্দ্র-প্রান্তের এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের সম্পর্কটি দৃঢ়বদ্ধ ও অবিচল রাখতে। যুগ্ম-বৈপরীত্যসূচক সম্পর্কের অবিচলতার ওপরই নির্ভর করে উপনিবেশকের সাফল্য ও স্থায়িত্ব এবং বিজিত জনগোষ্ঠীকে হীনবল রাখার প্রত্যাশিত সফলতা। ফলে ইউরোপের সমুদ্রবন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজগুলোতে কেবল

বাণিজ্যপণ্যই নয়, অধিকৃত ভূখণ্ডে চালান হতে থাকে আরো অনেক কিছু – ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা, পোশাক, প্রশাসন, এমনকি মানবিক চিন্তন-প্রক্রিয়া পর্যন্ত, যেগুলোর একমাত্র লক্ষ্য ছিল উপনিবেশ ও তার অধিবাসীদের উপর রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ও মানসিক আধিপত্য বিস্তার। উপনিবেশিত সমাজে ইউরোপীয় শক্তি শাসক ও শোষিতের মধ্যে যে জটিল সম্পর্ক নির্মাণ করেছে ফ্রাঞ্জ ফানো তাঁর *Black Skin, White Masks* গ্রন্থে তা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে – উপনিবেশী শাসনের কারণে উপনিবেশক এবং উপনিবেশিত উভয়ের মধ্যেই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। উপনিবেশিক শক্তির সচেতন চেষ্টায় স্থানীয়দের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-ভাষা ক্ষয় হতে হতে একসময় বিলীন হয়ে যায় অথবা মরে যায়। উপনিবেশিতের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সত্তার এই ক্ষয় বা মৃত্যু তার মনে জন্ম দেয় একরকম হীনমন্যতাবোধ ও অধস্তন চেতনা (Fanon 1986 : 10)। উপনিবেশিক শক্তির অব্যাহত প্রচেষ্টায় উপনিবেশিতের মনে উপনিবেশী সংস্কৃতির প্রতি সৃষ্টি করে এক অমোঘ আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাবোধ এবং একই সঙ্গে আপন ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি হীনমন্যতাবোধ। স্মরণ করা যাক ফানোর ভাষ্য :

উপনিবেশবাদ শুধু জনগোষ্ঠীকে এর আয়ত্তে শৃঙ্খলিত করেই তৃপ্ত থাকে না, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মস্তিষ্কের বিকাশ ও ঘিলু অসার করে দেয়। কোনো এক বিকৃতবুদ্ধি যুক্তির মাধ্যমে লাঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে পশ্চাৎপদ করা হয় এবং তাদের বিকৃত অবয়বহীন এবং ধ্বংস করা হয়। (Fanon 2006 : 28)

এভাবে আধিপত্যবাদী দর্শন চারশো বছর ধরে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারে ইউরোপীয়দের শক্তি জুগিয়েছে – পৃথিবীকে করেছে লুণ্ঠন। উনিশ-বিশ শতকে আধিপত্যবাদী এই শক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড। একইভাবে ভারতবর্ষও বন্দি হয়ে পড়ে উপনিবেশিক শক্তির এই সাংস্কৃতিক-জালে। উপনিবেশী শক্তির এই প্রচেষ্টা টমাস বেবিংটন মেকলের বিখ্যাত উক্তি থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। উপনিবেশিত ‘অপর’দের ‘সাদা মুখোশ’ (white masks) পরানোর কৌশল হিসেবে মেকলে লিখেছেন :

We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. (Woodrow 1862 :115)

– অর্থাৎ বিজিত দেশে শিক্ষা বিস্তারের মূল লক্ষ্য হিসেবে উপনিবেশী শক্তি সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। এই পরিকল্পনারই প্রত্যক্ষ ফল উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি। উপনিবেশী শক্তির এই বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক আত্মসানের স্বরূপ উন্মোচিত হয় নগুগি ওয়া থিয়োগোর ভাষ্যে :

সমষ্টিগত প্রতিরোধীদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ সবচেয়ে বড় যে অস্ত্র পরিচালনা করেছে, সেটা হলো সাংস্কৃতিক বোমা। এই সাংস্কৃতিক বোমার লক্ষ্য হলো মানুষের

নিজেদের পরিচয়, নিজেদের ভাষা, নিজেদের প্রতিবেশ, নিজেদের সংগ্রামের ঐতিহ্য, নিজেদের ঐক্য, নিজেদের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি খোদ নিজেদের ওপর থেকেই বিশ্বাস নষ্ট করে দেওয়া। নিজেদের অতীতকে অর্জনহীন এক পোড়ো ভূমি বলে পরিচয় করাতে চায় এবং মানুষের মধ্যে নিজ ভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতা লাভের স্পৃহা তৈরি করার প্রয়াসে থাকে এই সাংস্কৃতিক বোমা। (খিয়োগো ২০১০: ১৫)

৩

সংক্ষিপ্ত এই তাত্ত্বিক পরিচিতির পর এবার আমরা পাঠ করব রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। প্রথমেই নেওয়া যাক উনিশ শতকে রচিত ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পটিকে। লক্ষ করুন, গল্পের নামকরণেই আছে উপনিবেশের ছাপ। আরো লক্ষণীয়, বিখ্যাত এই গল্পের নায়কের নামটা পর্যন্ত আমাদের জানা হয় না, কেবল পোস্টমাস্টারের পদ দিয়েই লেখক আমাদের চিনিয়ে দেন নায়ককে। নায়ক বলছি বটে পোস্টমাস্টারকে, তবে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গল্পের প্রধান চরিত্র উপনিবেশিত উলাপুর গ্রামের অনাথা কিশোরী রতন। পোস্টমাস্টার তো উপনিবেশ-সৃষ্ট শহর কলকাতার মানুষ – তিনি কী করে মিশবেন অজপাড়াগাঁ উলাপুরের ‘অপর’দের সঙ্গে, কিংবা আরো স্পষ্ট করে বললে ‘অপর’ রতনের সঙ্গে। পাঠক, লক্ষ করুন, কলকাতায় বড়-হয়ে-ওঠা সদ্য-চাকুরে পোস্টমাস্টার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই বয়ান :

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গুণগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রভিত হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। (রবীন্দ্রনাথ ১৯৭৩ : ১৯)

– উদ্ধৃতাংশ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে শহর কলকাতার মানুষ পোস্টমাস্টার উপনিবেশের দয়া-দাক্ষিণ্যে সৃষ্ট একজন অভিজাত ‘ভদ্রলোক’। এমনকি তার এই ভদ্রলোকসত্তাকে প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ পোস্টমাস্টারের সর্বনামে ‘তাহার’ মাথায় চন্দ্রবিন্দু বসাতেও ভুল করেননি। উলাপুর গ্রামের কারো সঙ্গেই পোস্টমাস্টার মিশতে পারেন না – একথা বলার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দেন উলাপুর গ্রামের কোনো ‘অপর’ই পোস্টমাস্টারের সঙ্গে মিশবার উপযুক্ত নয়। তাহলে কি এইকথা ভাবা যায় না, মেকলে-সৃষ্ট মেকি ভদ্রলোকসত্তা বাসা বেঁধেছে কলকাতার মানুষ ‘আমাদের পোস্টমাস্টারের’ মধ্যে। লক্ষ করুন, পোস্টমাস্টারের আগে ‘আমাদের’ শব্দ বসিয়ে দিয়ে কোনো এক কথকের মুখ দিয়ে কিংবা রবীন্দ্রনাথ নিজেই পাঠকদের জানিয়ে দেন উলাপুরের পোস্টমাস্টারকে দেখা হচ্ছে ‘নেটিভদের’ চোখ দিয়ে।

পোস্টমাস্টারের মধ্যে কি দেখা দেয়নি ‘যুগ্ম-বৈপরীত্যের’ প্রথম অংশটা – যেখানে তিনি নাগরিক, কেন্দ্রবাসী, শিক্ষিত, মার্জিত ভদ্রলোক – বর্ষায় কদমাজ্ঞ প্রান্তিক উলাপুরে এলে যার অবস্থা হয় ডাঙায় তোলা জলের মাছের মতো? বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেই দিচ্ছেন এ-গল্প হচ্ছে কেন্দ্র-প্রান্তের বৈপরীত্যের গল্প, কেন্দ্রবাসীর সঙ্গে প্রান্তিক নিম্নবর্ণের অসম প্রতিযোগের প্রতিবেদন।

রতন পোস্টমাস্টারকে যতই দাদাবাবু বলুক, তার মা-কে মা আর দিদিকে দিদি বলুক – তাতে উপনিবেশ-সৃষ্ট পোস্টমাস্টারের কি কিছু যায়-আসে? রতন তো পোস্টমাস্টারের অবসর কাটানোর উৎস মাত্র – কখনো তাকে কবিতা শোনায়, কখনো শেখায় স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ, কখনো-বা খুঙ্গিপুথি নিয়ে পড়াতে বসে, যাবার সময় কিছু অর্থও দিয়ে যেতে চায়। এসব কিছুই কি উপনিবেশ-সৃষ্ট পোস্টমাস্টারের দয়া-দাক্ষিণ্য নয়? রতন তো চেয়েছিল একটা সম্পর্ক – কিন্তু পোস্টমাস্টার তো সেদিকে খেয়াল করারই প্রয়োজন বোধ করেনি। উপনিবেশ যে আমাদের সমাজে প্রচল মানব-সম্পর্কটাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে, পোস্টমাস্টার-রতনের গল্প দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কি সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন? প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় দেবেশ রায়ের এই ব্যাখ্যা :

বিচ্ছিন্নতা আর খণ্ডতার এ এক উন্মাদ জগৎ গল্পগুলিতে। মানুষ এখানে মানুষের কাছে যায় না। স্বাভাবিক বাঁধন থেকে মানুষকে ছিঁড়ে নেয়া হয়। সম্পর্কের স্বাভাবিক গতি এখানে হঠাৎ ঘূর্ণিতে ঢুকে পড়ে। যেন, রতনের পক্ষেই অস্বাভাবিক পোস্টমাস্টারের সঙ্গে অমন ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে পড়া, কারণ, রতন তো রতন আর পোস্টমাস্টার তো পোস্টমাস্টার মাত্র, চাকরি করতে আসে আর বদলি হয়ে চলে যায়। (দেবেশ ২০০৮ : ৭৪)

উপনিবেশের দয়া-দাক্ষিণ্যে সৃষ্ট মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্নতা প্রবঞ্চনা আর আত্মরতির পক্ষে নিমগ্ন উলাপুরের পোস্টমাস্টার। তাই যখন কিছুতেই তৈরি হয় না কোনো সম্পর্ক, যখন অঙ্গে ওঠে মেকলের মেকি-পরিচয়, তখন অগ্রভূমি আর পশ্চাৎভূমির যুগল-চাপে পোস্টমাস্টারের মনোলোকে জাগে এই আত্মরতির দর্শন :

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষা-বিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুশাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন – একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, ‘ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি’ – কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শাশান দেখা দিয়েছে – এবং নদী প্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার! (রবীন্দ্রনাথ ১৯৭৩ : ২৩)

উপনিবেশিত সমাজে কেউ যে কারো নয়, সর্বত্রই যে বিচ্ছিন্নতা খণ্ডতা আর প্রবঞ্চনার উন্মাদনা, তাতো ‘আমি’ আর সুরবালার গল্প ‘একরাত্রি’তেও দেখা যায়। পাঠক, লক্ষ করুন, এ গল্পেও নায়কের কোনো নাম নেই। ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে নায়কের পেশাগত একটা পরিচয় ছিল বটে, তবে এ গল্পে সেটাও নেই। উপনিবেশী শক্তির প্ররোচনা আর প্রভাবে উত্তম পুরুষ ‘আমি’ এখানে হতে চেয়েছে উত্তম ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে নিজেকে মেকলের মেকি-পরিচয়ে। ঔপনিবেশিক শাসনে গ্রামবাংলার সনাতন সংগঠন যে ভেঙে যাচ্ছে, মানব-সম্পর্কে যে পরিবর্তন আসছে, তার সাক্ষ্য হয়ে উঠেছে ‘একরাত্রি’। গল্পের নায়ক ‘আমি’ কৈশোরক কৌতূহলে আবিষ্কার করেছিল ইংরেজ উপনিবেশীর প্রতি মোহ আর মুগ্ধতা – ‘সর্বদাই দেখিতাম, আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদের অত্যন্ত সম্মান করিতেন – নানা উপলক্ষে মাছটা-তরকারিটা টাকাটা-সিকেটা লইয়া যে তাঁহাদের পূজার্চনা করিতে হইত তাহাও শিশুকাল হইতে আমার জানা ছিল; এইজন্য আদালতে ছোটো কর্মচারী এমন-কি পেয়াদাগুলোকে পর্যন্ত হৃদয়ের মধ্যে খুব একটা সম্বন্ধের আসন দিয়াছিলাম’ (রবীন্দ্রনাথ ১৯৭৩ : ৮৪)। ঔপনিবেশিক শিক্ষায় ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষকে অবহেলার পাত্র বিবেচনা করত, যেমন করে ‘আমি’ সুরবালার প্রতি। পোস্টমাস্টার যেমন রতনের প্রতি কোনো সম্পর্ক উপলব্ধি করে না, তেমনি করে না ‘আমি’ সুরবালার প্রতি। এখানেও তো দেখা যায় বিচ্ছিন্নতা আর খণ্ডতার উন্মাদ ভুবনের ছবি। অন্তর্গত সম্পর্কহীনতার কথাই ব্যক্ত হয় ‘আমি’র বয়ানে :

পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল, কিন্তু বর্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্যের কোনো গৌরব ছিল, না – আমি কেবল জানিতাম, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র। (রবীন্দ্রনাথ ১৯৭৩ : ৮৪)

– সুরবালা ‘আমি’র অবহেলার পাত্র বলেই সুরবালার বিয়ের সংবাদ জেনেও তার মধ্যে দেখা দেয়নি কোনো প্রকার কষ্ট বা যন্ত্রণাবোধ। ‘আমি’ নিজেই সংবাদটা আমাদের জানাচ্ছেন এভাবে – ‘দুই-চারি মাসের মধ্যে খবর পাইলাম, উকিল রামলোচনবাবুর সহিত সুরবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে ব্যস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল (রবীন্দ্রনাথ ১৯৭৩ : ৮৫)। ‘আমি’র আত্ম-বয়ানে প্রকাশিত হয়েছে উপনিবেশী ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষায় মেকি-মানুষ হওয়ার ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স। শেষ পর্যন্ত যে ‘আমি’ উজির নাজির সেরেস্টাদার জজ-আদালতের হেডক্লার্ক কিংবা মাটসীনি-গারিবল্ডি কিছুই হতে পারলো না, তারও প্রকৃত কারণ ছিল ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্র ও স্বার্থচেতনা। ঔপনিবেশিক উচ্চাভিলাষে আচ্ছন্ন থেকেও ‘আমি’কে যেতে হলো নোয়াখালির কোনো-এক ভাঙা স্কুলে, শিক্ষকতা করতে। পোস্টমাস্টার রতনকে ফাঁকি দিয়ে একরকম পালিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়, কিন্তু ‘আমি’ কলকাতায় পালিয়ে গিয়েও আবার নিঃসঙ্গ আশ্রয় পেয়েছে অজপাড়াগাঁয়ে – কেননা ততদিনে তার স্বপ্ন হারিয়ে

গেছে হাওয়ায় – এই হারিয়ে যাওয়াটাও যে ঔপনিবেশিক শোষণের ফল, তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। ‘ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার!’ – এই প্রবঞ্চনা-দর্শনের মতোই ‘একরাত্রি’র আমিও অন্তিমে দার্শনিকতার মোহন প্রলেপ জড়িয়েছে উপনিবেশিত অঙ্গে :

ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেসাদারও হই নাই, গারিবল্‌ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল – আমার পরমায়ুর সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা। (রবীন্দ্রনাথ ১৯৭৩ : ৮৯)

শৈশবে আদালতের কর্মচারীদের দেখে ‘আমি’র চেতনায় যে সম্রমের ভাব জাগ্রত হতো, এ তো নেটিভদের কাছে ক্ষমতা আর প্রভুত্বের অহমিকায় ইংরেজ কলোনাইজাররা যে শ্রেষ্ঠত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে চেয়েছিল, তারই স্বীকৃতি। ‘দিদি’ গল্পেও গ্রামীণ ‘অপর’দের মাঝে অভিন্ন মানসিকতার কথা আমাদের জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। ঔপনিবেশিক শাসনামলে সাধারণ মানুষের কাছে ইংরেজরা হয়ে উঠেছিল ক্ষমতাবান প্রভু, কখনো-বা দেবতা। নেটিভদের ভাবনায় ভয়ও আশ্রয় করেছিল। তারা দেখত, যে নায়েব-গোমস্তা-জমিদাররা খাজনা আদায় করত প্রবল পরাক্রমে, তারাই আবার ইংরেজদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত নতশিরে। ইংরেজদের প্রতি নেটিভদের চেতনায় বাসা বেঁধেছিল ভয়মিশ্রিত মুগ্ধতা। ‘দিদি’ গল্পে গ্রাম-প্রতিবেশে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আগমনে প্রকাশিত হয়েছে সাধারণ মানুষের অতলান্ত বিস্ময় অতুল মুগ্ধতা : ‘শীতকালে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব মফস্বল-পর্যবেক্ষণে বাহির হইয়া শিকার-সন্ধানে গ্রামের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছেন।... মধ্যাহ্নে চাপকান প্যান্টলুন পাগড়ি পরিয়া জয়গোপাল ম্যাজিস্ট্রেটকে সেলাম করিতে গিয়াছে। অর্থী প্রত্যাখী চাপরাসি কনস্টেবলে চারিদিক লোকারণ্য। সাহেব গরমের ভয়ে তাঁবুর বাহিরে খোলা ছায়ায় ক্যাম্প টেবিল পাতিয়া বসিয়াছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে স্থানীয় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। জয়গোপাল তাহার গ্রামবাসী সর্বসাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে স্তম্ভিত হইতেছিল...’ (রবীন্দ্রনাথ ১৯৭৩ : ২৮৮-৮৯)। উদ্ধৃতাংশ থেকে উপনিবেশিত বাংলার দুটো ছবি আবিষ্কার করা যায়। একদিকে ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবুর চারধারে গ্রামীণ নেটিভদের আগমন, যা মূলত ক্ষমতাধরের প্রতি দুর্বলের আরতি ও আরাধনা। অন্যদিকে, ম্যাজিস্ট্রেট যে জয়গোপালকে চৌকিতে বসিয়েছে, এবং তার সঙ্গে কথা বলছে এতে উপনিবেশিত বাংলার জয়গোপাল মনে মনে স্তম্ভিত হয়েছে। গোটা ছবিটাই ঔপনিবেশিক শক্তি বাঙালির মনোলোকে যে বিষক্রিয়া ছড়িয়ে দিয়েছে তার অভ্রান্ত রূপকল্প।

ঔপনিবেশিক বিষক্রিয়ার ভিন্ন এক প্রকাশ ঘটেছে ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পে। ইংরেজ কলোনাইজারদের শোষণ দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার উপনিবেশিত মানুষদের জীবন

কীভাবে দুর্বিষহ করে তুলেছিল তার শব্দছবি পাওয়া যায় এ গল্পে। ইংরেজদের প্রবল দাপটের মুখে শশিভূষণের প্রতিরোধ ভেঙে যায়, ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় তার পরাজয় হয়ে ওঠে অনিবার্য। কলোনাইজারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছিল শশিভূষণ। তাই কলকাতায় পলায়নপর শশিভূষণ হরকুমারের পক্ষে লড়বার জন্য গ্রামেই থেকে যায়, এবং জানায় এমন সিদ্ধান্ত :

জমিদারি কার্য উপলক্ষে নায়েবের শত্রু বিস্তর ছিল; তাহারা এই ঘটনায় অত্যন্ত আনন্দলাভ করিল, কিন্তু কলিকাতায় গমনোদ্যত শশিভূষণ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন তাঁহার সর্বাস্থের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রাতে তিনি হরকুমারের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন; হরকুমার তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন, ‘সাহেবের নামে মানহানির মকদ্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকিল হইয়া লড়িব।’ (রবীন্দ্রনাথ ১৯৭৩ : ২৩১)

ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় উপনিবেশ-সৃষ্ট আইনের আওতায় কলোনাইজারের বিরুদ্ধে নেটিভ শশিভূষণের পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও তাই শেষ পর্যন্ত ইংরেজ-সৃষ্ট বিচার-প্রশাসনের ষড়যন্ত্রে শশিভূষণকে জেলে যেতে হয়। শশিভূষণের এই পরিণতি সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত এখানে প্রণিধানযোগ্য :

ঔপনিবেশিক শাসকেরা নেটিভদের শরীর নিয়ন্ত্রণ করে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে, শশিভূষণের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই ঘটেছে। নিজেদের মতো আইনি ব্যবস্থা, পুলিশ, কারাগার আর ষড়যন্ত্র করে তার প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। এও সেই শরীরী-রাজনীতি যার কথা বলেছেন ফুকো। সাঈদ বলেছেন, ঔপনিবেশিক শাসকেরা এভাবেই নেটিভদের আচরণের সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে; তারা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, সেটা সহ্য করেনি। কেননা ক্ষমতায়নের কেন্দ্রে ছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের অবস্থান। ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে ভারতে ক্ষমতার বিন্যাসটি কেমন ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই গল্পে। উপনিবেশের তিন ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা শ্রেণি-প্রতিনিধি – ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, স্টিমারের ইংরেজ ম্যানেজার এবং ইংরেজ পুলিশের সঙ্গে শশিভূষণকে লড়াই করতে গিয়ে তাদের ষড়যন্ত্রে শেষ পর্যন্ত তাকে জেলে যেতে হয়। (মাসুদুজ্জামান ২০১২ : ৩১০)

‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পে উপনিবেশের আধিপত্যবাদী পরাক্রম অপ্রান্তভাবে রূপলাভ করেছে। ঔপনিবেশিক শক্তি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় – সকল ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে উপনিবেশগুলোকে, উপনিবেশের মানুষগুলোকে। নেটিভদের স্বকীয়তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে চেয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তি – স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে নেটিভদের দ্রোহী কণ্ঠস্বর। রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্প এ প্রসঙ্গে একটি উজ্জ্বল শিল্পকর্ম। শশিভূষণকে কারাবন্দি করার প্রতীকে আসলে তারা কারাবন্দি

করেছে নেটিভদের যাবতীয় সংস্কৃতি ও প্রতিরোধ ও দ্রোহচেতনা। তবু এডওয়ার্ড সাঈদ যে ‘প্রতিরোধের সাহিত্যের’ কথা বলেছেন, বিল অ্যাশক্রফট উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, কিংবা এলিয়েকে বোহেমার নির্দেশ করেছেন উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যের অন্তর্গত দ্রোহীভাব – রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পে তার অকাল-প্রকাশ দেখে একুশ শতকে বসে সচেতন পাঠককে বিস্মিত হতেই হয়। ভাবা যায়, সোয়াশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ কলোনাইজারদের সম্পর্কে যা বলেছেন, একুশ শতকের উত্তর-ঔপনিবেশবাদী ডিসকোর্সের তা-ই মূল সুর :

ম্যানেজার কেন যে এমন করিল তাহা বলা কঠিন। ইংরাজনন্দনের মনের ভাব আমরা বাঙালি হইয়া ঠিক বুঝিতে পারি না। হয়তো দিশি পালের প্রতিযোগিতা সে সহ্য করিতে পারে নাই, হয়তো একটা স্ফীত বিস্তীর্ণ পদার্থ বন্দুকের গুলির দ্বারা চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করিবার একটা হিংস্র প্রলোভন আছে, হয়তো এই গর্বিত নৌকাটার বস্ত্র-খণ্ডের মধ্যে গুটিকয়েক ফুটা করিয়া নিমেষের মধ্যে ইহার নৌকালীলা সমাপ্ত করিয়া দিবার মধ্যে একটা প্রবল পৈশাচিক হাস্যরস আছে; নিশ্চয় জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ইংরাজের মনের ভিতরে একটুখানি বিশ্বাস ছিল যে, এই রসিকতাটুকু করার দরুন সে কোনোরূপ শাস্তির দায়িক নহে – এবং ধারণা ছিল, যাহাদের নৌকা গেল এবং সম্ভবত প্রাণসংশয়, তাহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। (রবীন্দ্রনাথ ১৯৭৩ : ২৩৮)

ঔপনিবেশিক বাস্তবতার একটি সুস্পষ্ট ডিসকোর্স শিল্পিতা পেয়েছে ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পে। মিশেল ফুকোর মতে, ক্ষমতাসীনরা নিজেদের পরাক্রম ও ক্ষমতাকে অটুট রাখার জন্য সৃষ্টি করেছে আধিপত্যবাদী ডিসকোর্স (Foucault 1980 : 67)। ক্ষমতার জোরে ঔপনিবেশিক শক্তি নিজেদের প্রয়োজনে সৃষ্টি করে নিজস্ব আইন, পুলিশ বাহিনী, কারাগার। এসব সৃষ্টির উদ্দেশ্য উপনিবেশিত প্রতিবাদী মানুষের শরীর নিয়ন্ত্রণ। এ সূত্রেই মনে আসে প্রাচ্যবিদ এডওয়ার্ড সাঈদের অভিমত। সাঈদ জানিয়েছেন, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় নেটিভদের গ্রহণযোগ্য আচরণের সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। সীমা অতিক্রম করলেই নেমে আসে নির্যাতন-জেল-জুলুম। বক্ষ্যমাণ গল্পের শশিভূষণের পরিণতিতে সাঈদের এই সীমা-নির্দিষ্ট আচরণের (Said 2002 : 113) ব্যতিক্রম হলেই যে নেমে আসে নির্যাতন – তার স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করি।

ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ফলে বাংলার পল্লিগ্রামের সনাতন চারিত্র্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল – সমাজ-সংগঠনে দেখা দিয়েছিল নানামাত্রিক অসমতা, বিচ্ছিন্নতা ও অনন্বয়। উপনিবেশিত বাংলার পরিবর্তিত গ্রামসমাজের ছবিটা চিত্রিত হয়েছে এভাবে, গল্পের প্রারম্ভে – ‘গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা

করিত কেবল শশিভূষণ আর গিরিবালা’ (রবীন্দ্রনাথ ১৯৭৩ : ২২৭)। এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে দুটো সত্য বেরিয়ে আসে – এক. ঔপনিবেশিক শক্তির চাপে ভারতীয় সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, দুই. গ্রামসমাজ থেকে শিক্ষিত শশিভূষণও ছিল পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। ইয়োরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতীয় সমাজের এই বিচ্ছিন্নতার সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করে ক্রমে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতাটাই দখল করে নেয়।

উপনিবেশ বা উপনিবেশ-উত্তর কালখণ্ডে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে উপনিবেশিতের প্রতিবাদ-প্রতিরোধই উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের আলোচ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোচ্য গল্পে অতি সূক্ষ্মতার সঙ্গে ঔপনিবেশিক শক্তির ক্ষমতার দাপট এবং উপনিবেশিতের প্রতিবাদের ছবি নির্মাণ করেছেন। যদিও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে উপনিবেশিতের এই প্রতিবাদ পরিণতিতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তবু জানান দিয়ে যায় উপনিবেশিতের সমুখিত জাগরণের কথা। গল্পের নায়ক শশিভূষণকে দাঁড়াতে হয়েছে ক্ষমতা মদমত্ত তিন শক্তির বিরুদ্ধে। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, স্টিমারের ইংরেজ ম্যানেজার এবং ইংরেজ পুলিশের বিরুদ্ধে শশিভূষণ আইনি লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। তিন ‘ইংরেজ’ই যৌগ-বৈপরীত্যের (binary-opposition) সূত্রানুসারে আছে উত্তম অবস্থানে, পক্ষান্তরে শশিভূষণ আছে নিম্নস্তরে। যুগ্ম-বৈপরীত্যের প্রথম পক্ষ তো ক্ষমতার মালিক – পরাক্রম তাদের সীমাহীন, যেমন দেখি ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে। তাঁর পরাক্রম এমন ভয়ংকর যে, নিজের মেথরের অপমান পর্যন্ত তিনি সহ্য করতে পারেন না। ইউরোপীয় বাণিজ্যপুঞ্জির প্রতীক স্টিমারের ইংরেজ ম্যানেজার জলপথে ‘দিশি পালের প্রতিযোগিতা’ সহ্য করতে পারেননি। উপনিবেশিতের অযান্ত্রিক যানের প্রতিযোগিতা অসহ্য লেগেছে ইংরেজ ম্যানেজারের। তাই বন্দুক দিয়ে ফুটো করে দিয়েছে ‘দিশি’ নৌকার পাল – ফলে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে মহাজনের নৌকা। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, ইংরেজ ম্যানেজার কর্তৃক পাল ফুটো করে দেওয়া প্রসঙ্গে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে রচিত লেখকের এই ভাষ্য :

ম্যানেজার কেন যে এমন করিল তাহা বলা কঠিন। ইংরাজ-নন্দনের মনের ভাব আমরা বাঙালি হইয়া ঠিক বুঝিতে পারি না। হয়তো দিশি পালের প্রতিযোগিতা সে সহ্য করিতে পারে নাই, হয়তো একটা স্ফীত বিস্তীর্ণ পদার্থ বন্দুকের গুলির দ্বারা চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করিবার একটা হিংস্র প্রলোভন আছে, হয়তো এই গর্বিত নৌকাটার বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে গুটিকয়েক ফুটা করিয়া নিমেষের মধ্যে ইহার নৌকালীলা সমাপ্ত করিয়া দিবার মধ্যে একটা প্রবল পৈশাচিক হাস্যরস আছে; নিশ্চয় জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ইংরাজের মনের ভিতরে একটুখানি বিশ্বাস ছিল যে, এই রসিকতাটুকু করার দরুন সে কোনোরূপ শাস্তির দায়িক নহে – এবং ধারণা ছিল, যাহাদের নৌকা গেল এবং সম্ভবত প্রাণসংশয়, তাহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। (রবীন্দ্রনাথ ১৯৭৩ : ২৩৮)

– উদ্ধৃতাংশের শেষ অনুষ্ণট্টা ক্ষমতাধর ইয়োরোপীয় শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশক। যুগ্ম-বৈপরীত্যের প্রথম অংশটায় ইংরেজ ম্যানেজার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক, অন্যদিকে নেটিভরা

অপাঙক্তেয়, মানুষ হিসেবে হিসাবের বাইরে। মহাজনের নৌকাটি ছিল ‘দিশি’ অর্থাৎ অযান্ত্রিক। অন্যদিকে স্টিমারটি ছিল যান্ত্রিক। যান্ত্রিক স্টিমারকে তো প্রতিযোগিতায় জিততেই হবে অযান্ত্রিক ‘দিশি’ নৌকার সঙ্গে। কেননা যুগ্ম-বৈপরীত্যের প্রথমটা যান্ত্রিক স্টিমার তো ‘দিশি’ নৌকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ – আসলে প্রাচ্য নৌযান পাশ্চাত্য নৌযানের কাছে অপাঙক্তেয়। যুগ্ম-বৈপরীত্যের এই তত্ত্বকথা, যদিও রবীন্দ্রনাথের কালে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়নি, অসামান্য দক্ষতা ও সূক্ষ্মতায় ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে আইন-আদালতও যে ইংরেজ প্রভুদের পক্ষে, তারও অব্যর্থ রূপ রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য গল্পে। সাঈদের মতে, উপনিবেশের কেউ কেউ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আত্ম-অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়, ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে গড়ে তোলে প্রতিরোধ (Said 2002 : 78)। শশিভূষণ এই গল্পে সাঈদ-কথিত আলোকিত সেই মানুষ, যে ইংরেজ পরাশক্তির বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। শশিভূষণ আইনি লড়াই করে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে, স্টিমারের ইংরেজ ম্যানেজারের বিরুদ্ধে, ঔপনিবেশিক শক্তির সামরিক প্রতিনিধি ইংরেজ পুলিশের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেন যে, শশিভূষণ যতই আইন লড়াই করুক, যতই তিনি থাকুন ন্যায়ের পক্ষে পরিণতিতে হিংস্র ঔপনিবেশিক শাসকের কাছে তার ঘটবে অনিবার্য পরাজয়। রবীন্দ্রনাথ জানেন – ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বা ইংরেজ ম্যানেজারের কোনো শাস্তি হবে না, কথাটা যেন জানে শশিভূষণও। পরিণতিতে দেখা গেছে আইনের মারপ্যাচে দেশীয় মানুষই শাস্তি ভোগ করে, শশিভূষণকে পুলিশের হাতে লাঞ্চিত হতে হয় এবং পাঁচ বছরের জেল হয়। আসলে ঔপনিবেশিক আইনটাই ছিল ইংরেজদের পক্ষে, আর নেটিভ তথা ভারতীয়দের বিপক্ষে। ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী আপন শাসনক্ষমতা সুদৃঢ় ও স্থায়ী করার মানসে নিজেদের মতো ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করেছে আইনের বিধি-বিধান – ভারতীয়দের মধ্যে যে-ই দ্রোহীসত্তা নিয়ে রুখে দাঁড়াতে চেয়েছে, তাকেই আইনের মারপ্যাচে ফাঁসিয়ে দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে জেলে। শশিভূষণকে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার ঐতিহাসিক তাৎপর্য এই যে, ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে গেলেই নেটিভদের প্রতিরোধের ক্ষমতাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হবে। আইনি জটিলতায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক বর্বরতার কাছে পরাভব মানতে হয়েছে শশিভূষণকে (মাসুদুজ্জামান ২০১৮)। এভাবে ঔপনিবেশিক আইনের জটিল রূপটি অব্যর্থভাবে শিল্পিত করেন রবীন্দ্রনাথ, আলোচ্য গল্পে। শশিভূষণের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আসলে তুলে ধরতে চেয়েছেন প্রাচ্যের মানবিক ডিসকোর্স বা বয়ান। প্রাচ্যের মানবিক ডিসকোর্সের এই আবিষ্কার সাধনাই উপনিবেশের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধিক প্রতিরোধ, যা এই গল্পের পরতে পরতে শিল্পিতা পেয়েছে।

‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পে ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে উপনিবেশিত বাঙালির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক লেখক চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের নামকরণের মধ্যেও আছে,

ধারণা করি, ওই সম্পর্কের আভাস। উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের যুগ্ম-বৈপরীত্যের প্রথম ভাগের মেঘ কি কৃষ্ণবর্ণের বাঙালি আর রৌদ্র কি উজ্জ্বল শ্বেতাঙ্গ মানবতার প্রতিনিধি ইংরেজ-শাসক? উপনিবেশ যে আমাদের প্রচল মানব-সম্পর্কটাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে, বক্ষ্যমাণ গল্প থেকে আমরা সে-ধারণাও লাভ করি। অন্যদিকে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার প্রতিনিধিত্ব করেছে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর, স্টিমারের ম্যানেজার ঔপনিবেশিক বাণিজ্যপুঁজির। আর হরকুমার-জেলে শ্রেণিসহ দেশীয় সব মানুষ ‘নেটিভ’, অন্য ভাষায় ‘অপর’ (other)। শশিভূষণ ছিলেন প্রতীচ্য রেনেসাঁস প্রভাবিত নবজাগ্রত ভারতীয়দের প্রতিনিধি। ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে ভারতীয়দের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে ইউরোপীয়রা বরাবর থাকতে চেয়েছে শীর্ষে, তাদের চোখে ভারতীয়রা সেবাদাস, অপাঙক্তেয়। প্রভুর ইচ্ছা অনুসারেই চলতে হবে দাসকে, তার নিজস্ব চিন্তা বলে কিছু নেই। ইংরেজদের ইচ্ছানুসারে যে চলতে হবে ব্রাত্য ভারতীয়দের। স্টিমারের ইংরেজ ম্যানেজার ‘দিশি পালের’ নৌকার পাল গুলি করে ফুটো করে নৌকাটি ডুবিয়ে দিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশিটা ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছে। ইউরোপীয় যন্ত্রসভ্যতা আর দেশীয় প্রযুক্তির অসম প্রতিযোগিতায় দেশীয়রা জয়ী হবে, আর হেরে যাবে ঔপনিবেশিক শক্তি – একথা ইংরেজ ম্যানেজারের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে যে যুগ্ম-বৈপরীত্যের তত্ত্বটাই অসার হয়ে যায়। ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথ এই তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর সম্মুখেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

সূচনাসূত্রেই ব্যক্ত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই উপনিবেশিত বাংলার নানামাত্রিক ছবি চিত্রিত হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় আমরা মাত্র চারটি গল্পের আলোকে বিষয়টিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। ‘দেনাপাওনা’, ‘রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা’, ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’, ‘একটা আষাঢ়ে গল্প’, ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘সমস্যাপূরণ’, ‘প্রায়শ্চিত্ত’, ‘বিচারক’, ‘রাজটিকা’, ‘দুর্ভিক্ষ’, ‘উলুখড়ের বিপদ’, ‘নষ্টনীড়’, ‘কর্মফল’, মাস্টার-মশায়’, ‘রাসমণির ছেলে’, ‘শান্তি’, ‘হালদারগোষ্ঠী’, ‘ভাইফোঁটা’, ‘নামঞ্জুর’, ‘সংস্কার’, ‘শেষকথা’ – এসব গল্পেও উপনিবেশিত বাংলার জীবন ও জনপদের নানামাত্রিক ছবি রূপলাভ করেছে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা রবীন্দ্র গল্প-সমীক্ষায় সম্ভব করতে পারে ভিন্ন মাত্রা।

গ্রন্থপঞ্জি

দেবেশ রায়, ২০০৮। *বিপরীতের বাস্তব : রবীন্দ্রনাথের গল্প*, কলকাতা

নগুগি ওয়া থিয়োসো, ২০১০। *ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড* (অনুবাদ : দুলাল আল মনসুর), ঢাকা

মাসুদুজ্জামান, ২০১২। ‘উপনিবেশবাদ উত্তর-উপনিবেশবাদ ও রবীন্দ্রনাথ’ (শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত *সাম্প্রতিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ* শীর্ষক গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ), ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭৩। গল্পগুচ্ছ, কলকাতা

Bill Ashcroft et. al.(eds.), 1995. *The Post-colonial Studies*, London

Edward Said, 2002, *Power, Politics, and Culture*, New York

Frantz Fanon, 1986. *Black Skin, White Masks* (Translated by Charls Markmann), London

Frantz Fanon, 2006. *The Wretched of the Earth* (জগতের লালিত : অনুবাদ – আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া, ২০১৪), ঢাকা

H. Woodrow, 1862. *Macaulay's Minutes of Education in India*, Calcutta